পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রিয় সহকর্মী ও কর্মকর্তাবৃন্দ,

আসসালামু আলাইকুম।

এবারের সরকার গঠনের পর পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে এটিই আমার প্রথম পরিদর্শন।

পার্বত্য অঞ্চলের সকল জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতি, অবকাঠামোসহ বিভিন্ন খাতের সুষম উন্নয়নের মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এ অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৮ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রনালয় গঠন করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন ছিল, দুর্গম পার্বত্য জেলা সমূহের নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীকে বৈষম্য-বঞ্চনার অভিশাপ থেকে মুক্তি দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশে মর্যাদার সাথে স্বনির্ভর হয়ে বাঁচার সুযোগ নিশ্চিত করা। উন্নয়নের নামে তাদের বাস্তুচ্যুত না করে প্রাকৃতিক আবহ অক্ষুন্ন রেখেই আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ব্যবস্থা করা।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭০ সালে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামে যান। তখনই পার্বত্য অঞ্চলের ভূ-বৈচিত্র্য, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য এবং বসবাসকারী ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর বিষয়ে আমার সরেজমিনে জানার সুযোগ হয়।

পার্বত্য জনগোষ্ঠীর প্রতি জাতির পিতার গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধকে উপজীব্য করেই দীর্ঘ সময়ের অচলাবস্থা, আস্থাহীনতা এবং উন্নয়ন প্রতিবন্ধকতা দূর করতে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি স্বাক্ষর হয়। শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আমরা জাতিসংঘের ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার অর্জন করেছি।

শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দুই দশকের অশান্ত পাহাড়ে আওয়ামী লীগ সরকারই শান্তি ফিরিয়ে আনে। সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ ও তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয়।

শান্তিচুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রযাত্রায় বিভিন্ন নীতি নির্ধরণী বিষয় ও বিভাগ সমূহের নিয়ন্ত্রণ হস্তান্তরের ফলে আজ পার্বত্য অঞ্চলে স্থিতিশীলতা অনেকাংশে ফিরে এসেছে। পারস্পরিক সম্প্রীতি ও আস্থা বৃদ্ধি পেয়েছে। উন্নয়ন সহযোগীরাও এগিয়ে এসেছে এবং দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহায়তা সম্প্রসারিত হচ্ছে।

এ অঞ্চলে স্থাপিত সেনা ক্যাম্পগুলি পরিস্থিতির নিরিখে প্রত্যাহার করা হয়েছে। সামরিক সরকারগুলোর মত এখন কোন অবস্থাতেই পাহাড়ে সেটেলারদের রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় স্থানান্তর করা হয় না।

আমাদের সরকারের সদিচ্ছা ও আন্তরিকতা রয়েছে বলেই আমরা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কমিশনকে পার্বত্য জেলায় জরিপ ও তথ্য সংগ্রহে সব রকম সহযোগিতা দিচ্ছি।

আমি আশা করি, চুক্তির যে সকল বিষয় এখনো বাস্তবায়নের অপেক্ষায় রয়েছে, সেগুলো দ্রুততার সাথে শেষ করতে মন্ত্রণালয় এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহ তৎপর থাকবে। আপনাদের এ সফলতা পার্বত্যবাসীকে অগ্রগতি ও শান্তির পথ দেখাবে।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ,

শান্তিচুক্তির পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য একজন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। আমরা তিন পার্বত্য জেলার জমি বিষয়ক বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি কমিশন আইন ২০০১ সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছি। সুপ্রীম কোর্টের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে প্রধান করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিশন পুনর্গঠন করা হয়েছে।

আপদকালীন পরিস্থিতি মোকাবেলা কর্মসূচী, ভারত প্রত্যাগত অ-উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়নের ধারাবাহিকতায় রাঙ্গামাটি নার্সিং ইনস্টিটিউট, খাগড়াছড়ি যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন ও জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতাধীন অফিসসমূহ, তুলা উন্নয়ন বোর্ডের জোনাল অফিস এবং মৎস্য খামার সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলা পরিষদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।

দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় নতুন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা এবং অকার্যকর বিদ্যালয়সমূহকে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে চালু করে ২০ হাজারের অধিক শিশুর পড়ালেখার সুযোগ সৃষ্টি করেছি। পার্বত্য অঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দানের জন্য বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠির ভাষায় বর্ণমালা সংরক্ষন এবং নিজ নিজ ভাষায় শিক্ষাদানের কাজ শুরু করা হয়েছে।

আমরা তিন পার্বত্য জেলায় মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপন করেছি। এ অঞ্চলের জন্য পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল থেকে এএসআই পদ মর্যাদার চাকুরিতে ৫০ ভাগ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোটা সংরক্ষণ করা হচ্ছে।

উপজাতীয় সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডকে জাতীয় পর্যায়ে বিকশিত করতে তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা হয়েছে। ইনস্টিটিউটগুলো পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ধারা ও ঐতিহ্য এবং স্বকীয়তা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট আছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি সার্কেল প্রতিষ্ঠার ১২৮ বছরের মধ্যে এই প্রথম আমি প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জেলাগুলোর সার্কেল প্রধান ও হেডম্যানসহ উপজাতীয় নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছি।

আমাদের বিগত সরকার আমলে সার্কেল চীফ (রাজা) সম্মানী পাঁচ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকা, হেডম্যানের সম্মানী ৩০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা এবং কারবারিদের সম্মানী ২০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকায় উন্নীত করেছি।

পার্বত্য চট্টগ্রামে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ২ লক্ষ ২৫ হাজার টন খাদ্যশস্য ও ৭ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

কৃষি, শিক্ষা, ধর্ম, যোগাযোগ, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, ক্রীড়া, সংস্কৃতিসহ বিভিন্ন খাতে ১ হাজার ২৪৬টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলের নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক গুরুত্ব অপরিসীম। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অগ্রগতির জন্য অবকাঠামোসহ অন্যান্য খাতসমূহে দ্রুত ও সুষম উন্নয়নের জন্য পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়, পার্বত্য আঞ্চলিক পরিষদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড, তিনটি পার্বত্য জেলা পরিষদ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

সম্প্রতি পার্বত্য তিনটি জেলা পরিষদের সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

হস্তান্তরযোগ্য ৩৩টি বিভাগ ও বিষয়ের মধ্যে ২৯টির কর্তৃত্ব পার্বত্য জেলা পরিষদসমূহে হস্তান্তর করা হয়েছে।

শান্তি চুক্তি অনুযায়ী বাস্তবায়নযোগ্য মোট ৭২টি ধারার মধ্যে ইতোমধ্যে ৪৮টি ধারা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। ১৫টি ধারা আংশিক এবং ৯টি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীর প্রত্যাশা অনুযায়ী ঢাকায় বেইলী রোডে 'পার্বত্য চট্টগ্রাম কমপ্লেক্স' নির্মাণের জন্য ১ দশমিক ৯৬ একর ভূমি প্রদান করা হয়েছে।

পার্বত্য অঞ্চলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেডিকেল কলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

এ অঞ্চলকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে ইতোমধ্যেই একটি সেল গঠন করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের উন্নয়ন বেগবান করার লক্ষ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড অধ্যাদেশ ১৯৭৩ সংশোধন করে আইনে পরিণত করা হয়েছে। এর ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের প্রকল্প গ্রহণে আর্থিক ক্ষমতা ২৫ লক্ষ টাকা থেকে ২ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে দীর্ঘ দুই দশকের সংঘাতময় পরিস্থিতির অবসানে এই অঞ্চলে সৃষ্ট উন্নয়ন সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার আন্তরিক রয়েছে।

শিক্ষার প্রসার, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, ভূমি সমস্যার সমাধান, কৃষি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, জুম চাষের বিকল্প হিসাবে ফলজ বাগান সৃজন, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য সংরক্ষণে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানসমূহকে এলাকাবাসীর প্রয়োজন অনুযায়ী ক্রমাগতভাবে শক্তিশালী করা হচ্ছে। ফলে পার্বত্য অঞ্চলে বিনিয়োগ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

প্রিয় সহকর্মীবৃন্দ,

আমাদের সরকার একটি সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে সমগ্র দেশকে উন্নয়নের মহাসড়কে নিয়ে আসতে কাজ করে যাচ্ছে। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া অঞ্চলসমূহকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করা। পার্বত্য জেলা সমূহেও উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত রেখে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রার মান সমতলের মতই বৃদ্ধি করা হবে।

সরকারের এই লক্ষ পূরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়কে সততা, দক্ষতা, আন্তরিকতা ও পেশাদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করে যেতে হবে।

ইনশাল্লাহ, আমরা সবাই যার যার অবস্থান থেকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলব।

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু,
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক ।

...